# ক্ষণকথকের সুবচন

## অহনা বিশ্বাস

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে আমি অল্পবয়স থেকে চিনতাম। না, সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। আমার বাবার ভাণ্ডার থেকে তাঁর সম্পাদিত দুটি ‘কবিতা-পরিচয়’ পত্রিকা পেয়েছিলাম। তখন সদ্য সদ্য কবিতা পড়া শুরু করেছি। সেই ক্ষীণ-আয়তন পত্রিকা-দুটি আমাকে কবিতার সরোবরে আরও একটু নিমগ্ন হতে সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই। পরে লাইব্রেরি থেকে পেয়েছি— তাঁর সম্পাদিত দু’মলাটে বন্দী ‘কবিতা-পরিচয়’। কবিতা বোঝবার নাকি বাজবার— সে রহস্য ভেদে কবিতাপ্রেমীদের কাছে এই বই ধর্মগ্রন্থ হতে পারে।

তখনও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্য কাজ দেখিনি। আমার পরিধি কখনই খুব একটা বিস্তৃত ছিল না। সত্যি বলতে কী— চাকরি পাবার পর ছাত্রদের প্রয়োজনেই ‘কর্মক্ষেত্র’ পড়তে লাগলাম মনোযোগ সহকারে।

আমি গ্রামের কলেজে পড়াতাম। সেখানে আমাদের দেশের মাটিসংলগ্ন উজ্জ্বল তরুণ-তরুণীদের আমি সঙ্গ পেতাম। কিন্তু তাদের জন্য তেমন কোনও দিশা কিছু ছিল না। দিশা দেখানোর কোনও উদ্যোগ সরকারি তরফে এদের কাছে নেমে আসেনি। ফলে কলেজ-জীবনের পর পিতৃপুরুষের জীবিকা হারিয়ে, ডিগ্রির তিলক কপালে পরে হোয়াইট কলারের চাকরির অভাবে নৈরাশ্যের চাদরের ভেতরে আত্মগোপন করত। ‘কর্মক্ষেত্র’ তাদের কাছে পরশমণি ছিল। আমি শুধু চাকরির খবরের কথা বলব না, আমি বলতে চাইব বরং এই পত্রিকার ব্যবসা করার গলিঘুঁজির খবর দেওয়ার কথা। ‘কর্মক্ষেত্র’-য় আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিল্পসম্ভাবনার স্বপ্ন গাঁথা থাকত। তাতে তারা শুধু নিজেই লাভবান হতো না, তারা আরও অনেকের অন্নসংস্থান করতে পারত। তাই ‘কর্মক্ষেত্র’ আমার মতো অনেকের কাছে প্রণম্য ছিল। তখন মনে হয়েছিল উনিশ শতকের বাংলার আলোকিত মহাজনরাই কেবল বাঙালি জাতির কথা ভাবেননি। বতর্মান সময়ে আরও একজন যিনি বাঙালির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা ভেবেছেন— তিনি হলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। আসলে তিনি নিজেই একজন এমন পরশপাথর, যে তিনি যাতেই হাত ছোঁয়ান— তাই সোনা হয়ে ওঠে।

এরপর তাঁর ‘ভ্রমণ’ পত্রিকা দেখেছি, তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ক ডক্যুমেন্টরি দেখেছি। পড়েছি তাঁর সোনার কলমে, রুপোলি কালিতে লেখা শিশু নাকি বুড়োশিশুদের জন্য

লেখা কথাকাহিনি! অনেক পরে পড়েছি তাঁর কবিতা, তখন মনে হয়েছে— তাঁর কবিতা আগে পড়িনি কেন, মনে হয়েছে— কবি হিসেবে তাঁর আরও একটু প্রচার প্রয়োজন ছিল। কে জানে কেন মনে হয়, তিনি বোধহয় নিজেই তা চাননি। সুবিশাল কর্মযজ্ঞের কাণ্ডারী, যিনি অতি মৌলিক ভাবনার অধিকারী সেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে মানুষটি, তিনি তাঁর কবিসত্ত্বাকে যেন একটু লাজুক আবরণে মুড়ে নিভৃত্বে রাখতে চেয়েছেন। আমার তো এমনটাই মনে হয়েছে।

এরপরই 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকায় পেয়ে গেলাম অসাধারণ সব সূক্তিমালা। 'ক্ষণের বচন'। সে বচনের রচয়িতা কোনও এক ক্ষণকথক। কিন্তু কে এই ক্ষণকথক? সময়ের মহাজগত থেকে কে একটি একটি করে তুলে আনছেন নক্ষত্রের দানা আর আমাদের কালো আকাশকে সাজিয়ে তুলছেন? শুধু কি চমকিত হচ্ছি! ভাবছি, ভাবতে বাধ্য করছে 'ক্ষণের বচন'। কথকের যেমন পর্যবেক্ষণ, যেমন রসবোধ, তেমনই চাবুক, তেমনই উপলব্ধি।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো— এই প্রবাদের নমুন পেয়েছি চর্যাপদে। হয়তো তারও কত আগে থেকে চলে আসছে এইসব মহৎ কবিতার পংক্তি। কেবল সেইসব কবির নামটি জানি না। সমস্ত অলংকারের ভারমুক্ত হয়ে সেইসব প্রবাদ-প্রবচনের পংক্তি এমনই এক সরল অর্থ গভীর ভাবনার বাহক, যে শতকের পর শতক ধরে সেইসব বচন মানুষের মনকে এক পরম ঝাঁকুনি দিয়েছে। আর তারপর তাকে ঘাড় ধরে জীবনের সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আগেকার দিনের বাংলার মা-দিদিমারা কথায় কথায় এমন কত সব ছড়া কাটতেন। সামান্য অন্তমিল, চেনা, সাদামাটা ঘরসংসারের ছবির মধ্যে দিয়ে সেই ছড়া থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে আসত এমন সব অমোঘ উচ্চারণ, যা মুহূর্তে ছিঁড়ে দিতে পারত সমাজ-জীবনের রঙকরা মুখোশটিকে। মেলায়, চণ্ডীমণ্ডপে, বিয়েবাড়িতে এমন করেই তো শিক্ষার আসর বসাতো পুরাতন ভারতবর্ষের ভাট-কথকেরা।

'ক্ষণের বচন'-এর লেখক ভারতীয় এই কথকতার উত্তরসূরী বলেই, লেখকের নামের স্থানে তিনি কোনও ব্যক্তিনাম না লিখে 'ক্ষণকথক' লিখেছেন। তার খনার বচনের মতোই তাঁর এইসব সদুক্তি গভীরভাবে সমাজ-নিরীক্ষণের ফসল।

বচন লিখতে গেলে কথককে অতিসজাগ থাকতে হয়। এই সদা জাগ্রত থাকাকেই পরমধর্ম বলে মনে করেছেন বলে— কথক এই স্বল্প আয়তন মহাগ্রন্থটি শঙ্খ ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গলিপিতে স্পষ্ট, যে শঙ্খ ঘোষকে এইসময় তিনি একজন শুধুমাত্র কবি হিসাবেই বিচার করছেন না। এখানে শঙ্খর স্থির সামাজিক বিবেককেই কবি স্তুতি করছেন।

'শংকাকালে জেগে থাকা যাঁর কবিতায় মানুষের ধর্ম
চারপাশের ভালোবাসা হননে যাঁর কবিতায় রক্তক্ষরণ'

ক্ষণকথক জেগে বসে আছেন। বসে আছেন সমাজের দিকে, ক্ষমতার দিকে, প্রতিষ্ঠানের দিকে তীব্র চোখে চেয়ে। তারপর বিদ্যুতাচমকের মতোই তাঁর চকচকে খড়্গ প্রসারিত হচ্ছে অন্যায় দম্ভের দিকে, বাক্যবাণ বিঁধে যাচ্ছে ক্ষমতা-সিংসহাসনের গদিতে।

ক্ষণেরবচনের ধারালো অসিগুলির কয়েকটি তবে পাশাপাশি রাখি।

১. 'গণতন্ত্রের জয়গান স্বার্থসিদ্ধি যদি
দুঃখে দেশ কাঁদে, অশ্রু বহে নিরবধি।'

২. 'মিথ্যার বিরুদ্ধে যদি মিথ্যার পাহাড়
তারও জবাবে মিথ্যা যদি খ্যাপা ষাঁড়
অকাল সন্ধ্যায় তবে কুবাতাস বয়
বসন্তেও যথাতথা শিলাবৃষ্টি হয়।'

৩. 'দায়িত্ব যখনই হয় দম্ভের বিষয়
সে-দায়িত্ব হয়ে ওঠে ভারি বিষময়
ক্ষমাপ্রার্থনা যদি ক্ষমতা প্রকাশ
লাঞ্ছিতজনেরও জেনো জ্বলে হাড়মাস'

৪. 'রাজার পতন যদি প্রজার কল্যাণ
যত দেরি হবে তত হবে রক্তস্নান।'

৫. 'দুষ্কৃতিজনের সখা যেখানে পুলিশ
সজ্জনের শান্তির আশা সেখানে ভুলিস।'

কিন্তু শুধুই কি সমালোচনা? কথক কি বলবেন না, তাঁর মনে উপযুক্ত শাসকের, না নেতার রূপটি কেমন! তাও জানিয়েছেন কথক।

ক. 'দেশের প্রেমিক যদি দেশের শাসক
সে যেন হৃদয়ে ধরে যা দুঃখ, যা শোক।'

দেশের জননেতাকে কথক তাই সচেতন করেছেন—

খ. 'যত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবে
তত বেশি ফন্দিবাজ পূজিবে সরবে।'

কিংবা

গ. 'আমি করি আমি দিই আমিই তো সব
আমি আমি থেকে অমাবস্যার উদ্ভব।'

কিংবা

'দুষ্টজনে নিন্দা করা নিন্দনীয় নয়
দম্ভ তাতে মিশে গেলে বিষময় হয়।'

কথক শুধু তো ক্ষমতাবান মানুষ, রাজা বা নেতাকে তাক করে অস্ত্রনিক্ষেপ করেন না। জীবনের সর্বত্রই তাঁর চোখ, তাঁর মনোযোগ। কথককে তাই ধর্ম নিয়েও বলতে হয়, শিক্ষা নিয়েও বলতে হয়। পুরনো কথকোবিদরা তো জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখতেন না।

ধর্মজীবী, ধর্মের ধ্বজাধারীদের সম্পর্কে কথককে বলতে হয়—

'মন্দিরে পূজাই দাও, মসজিদে নামাজ—
মানুষ সবাই এক, ভুললে শিরে বাজ।'

শিক্ষাজীবীদেরও বলেন—

'বিদ্যাদানে যদি মিশে যায় অর্থলোভ
অমৃতের পুত্রও শেখে বিষাক্ত সম্ভোগ।'

চিকিৎসাজীবীকেও সচেতন করেন—

'আরোগ্যের বিনিময়ে অর্থের লালসা
জীবনানন্দ খেয়ে, ফেলে রাখে খোসা।'

ক্ষণকথক সমাজ বা মানুষ বিষয়ে ভাবেন সত্য আর সে নিয়ে না ভেবে একজনও কেউ সাহিত্যকার থাকতেও পারবেন না। কিন্তু যে শব্দে বাক্যে তিনি তাঁর সত্যকে প্রকাশ করেন, তা নিয়েও তিনি সচেতন বই কী।

তাঁর অবগুণ্ঠনমুক্ত স্পষ্টবাক্যে সৎ, চালাকিবিহীন, চিরকালীন সাহিত্যদর্শন পরিস্ফুট হয়। যেমন—

ক. 'রাঙাখোসাসম বাক্য, কিন্তু পচা শাঁস—
এমন মুখের কথা আনে সর্বনাশ।'

খ. 'শব্দ যদি মিথ্যাভাষী
তাজা ফুলও হয় বাসি'

গ. 'সাহিত্য যখন হয় শুধু বিলাসিতা
মানুষ বিপন্ন হয়, সাধ্বীও পতিতা।'

ঘ. 'কবি-শিল্পী যদি হয় ক্ষমতার অন্ধ কাছাকাছি
প্রজাদের সঙ্গে রাজা গ্রীষ্মে খেলে ঘোর কানামাছি

ঙ. 'চিৎকারের চেয়ে চিন্তা যদি করো বেশি
সত্যের সাহায্য তুমি পাবে শেষাশেষি।'

শেষপর্যন্ত চিৎকারের থেকে চিন্তাই প্রধান বলে, কবির প্রবল চিন্তাশক্তি, বিচারবোধ বা সমবেদনার কাছে শাসককেও নত হতে হয়। তাঁর কথা শুনতে হয়। কেননা ক্ষণকথক জানেন, কবির কাছে মানুষের দীর্ঘশ্বাস জমা থাকে।

একজন কবির সমাজ, ভূগোল তো শুধু মানুষকে নিয়েই হয় না। মানুষ বাদেও যে বড় প্রকৃতিসমাজ— কথকের দৃষ্টি সেখানেও পড়ে। কিন্তু কথক যে সময়ের ধারাভাষ্যকার, তাঁর তো শুধুমাত্র প্রকৃতির বর্ণন কাজ নয়। সময়ের দাবীকে মান্য করে কথক তখন পরিবেশবিদ।

ক. 'নদীই জীবন, নদী মাতৃস্তন্যপান।
সয় না সে তার হত্যা, তার অপমান!'

খ. 'ফুল পাখি অরণ্য আকাশ
যতো লোপ পায় ততো বাড়ে হাহুতাশ।'

আবার মানুষের দম্ভের পাশে প্রকৃতির সহিষ্ণুতা পর্যবেক্ষণ করে কথক বলতে পারেন—

'সূর্যালোকে বাঁচে মর্ত্য—

নেই হাততালি শর্ত।'

কিংবা

'গাছের কী দেবার আছে
ঘোষণা ঝোলে না গাছে।'

আসলে শুধু বহিঃপ্রকৃতিই নয়, মানুষের অশুরপ্রকৃতি, তার প্রবৃত্তিকে সত্যনিষ্ঠ কথক যেখানে উন্মোচন করেন—

ক. 'যত বাড়ে গালমন্দ
দু পক্ষই তত অন্ধ।'

খ. 'ক্রোধে ঢাকে বোধবুদ্ধি
পুড়ে ছাই আত্মশুদ্ধি।'

আসলে এ তো শুধু সচেতনতার কথা নয়, এ উপলব্ধিরই কথা। আর পরম উপলব্ধিকেই আমি কবিতা বলে জানি। কবিতা উপদেশের মোড়কেই আসুক, অথবা অন্যকে সে আক্রমণই করুক কথকের নিজের 'আমি'টিকে বাদ দিয়ে কবিতা কখনও প্রতিভাত হয় না। কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার প্রিয় বচনগুলি এখানে ফের তুলে ধরি, যা অননুকরণীয়, যা চিরকালীন, যা ধ্রুপদী, যা প্রবাদ, যা কবিতা শিরোমণি।

১. 'ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ গুণ
মাঘের শীতে কাঠের আগুন।'

২. 'জীবন আশ্চর্য সৃষ্টি, অল্পেই অসীম
বড় লাভ-লোভে হয় শুষ্ক কাঠ, হিম।'

৩. 'ধামাচাপা দেওয়া ঘা
কারো আয়ু বাড়ায় না।'

৪. 'যে ফুলের ঠিক যা গন্ধ
বোঝে যে এমনকী অন্ধ।'

৫. 'ভালো-মন, ভালো-চোখ, হও ভালো লোক
যেমন পাখির গায়ে পাখির পালক।'

৬. 'বিকেলবেলার হলুদ নদীর ধারে
সবাই সবার বন্ধু হতে পারে।'

৭. 'মিথ্যাকে পরাও যদি সত্যের পোশাক
মনে রেখো মাছ ঢাকতে চিরব্যর্থ শাক'

৮. 'খুবই সোজা দয়ামায়া
মধ্যাহ্নে বটের ছায়া।
অনায়াসে অজ্ঞাতে
ছায়া দেয় যাতে-তাতে।'

৯. 'একে সত্য, দুইয়ে শিষ্য, দশে অন্ধ তালি।

এই হল চিরকাল পথের পাঁচালি।

এই হল আধুনিক সময়ের দলিলের কিছু খণ্ডচিত্র। ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকাল যদি যুক্ত হয়, তবে সেই রচনা চিরস্থায়ী হবার ক্ষমতা রাখে। 'ক্ষণের বচন'-এ আছে তেমনই এক একটি গুরু দোহা, নতুন প্রবাদ, সত্যের মতো প্রবচন। শব্দ ও বাক্যগুলোকে সরলভাবে বইয়ে দিতে পেরেছেন বলে কথক অনেকসময় যতিচিহ্নের কথা মাথায়ও রাখেননি। তাতে রসসম্ভোগে বাধা হয়নি। আসলে এ যেন পাঠ্য কবিতা নয়, শ্রুতিসাহিত্য, কর্ণামৃত। তার আসল দাঁড়ি-কমা থাকে কথক ও শ্রোতার মনে, ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়।

যে কথা বলে শেষ করি, তা হল, যখন 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকায় বচনগুলো পড়ছিলাম, তখনও নয়, অনেক পরে জেনেছি এই ক্ষণকথক ঠাকুর আসলে আর কেউ নন, স্বয়ং অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম।

**লেখক পরিচিতি**

*জন্ম ১৯৭০*

*পেশা: কলেজ শিক্ষকতা*

*লেখক*